সত্যজিৎ রায়

কলকাতার ময়দানে শহীদ মিনারের আশে-পাশে প্রতি রবিবার বিকেলে যে এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে সেটা আমার আগে জানা ছিল না। বছর পাঁচেক আগে একবার ঘটনাচক্রে সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেবেলা সার্কাস-কার্ণিভ্যাল দেখতে যাওয়াটা ছিল বড়দিনের একটা বড় আমোদ। কার্ণিভ্যাল বহুদিন হল উঠে গেছে। মাদ্রাজী সার্কাস শুনেছি ভালোই, কিন্তু হার্মস্টোন-কার্লেকারের মতো ভালো কি না সে বিষয় সন্দেহ হয়। কিন্তু কার্ণিভ্যাল সার্কাস দুইয়েরই স্বাদ যে প্রায় সারা বছর ধরেই পাওয়া যায় আমাদের এই ময়দানে, সেটা শহরের কটা লোক জানে?

এক তো আছে নানারকম টোট্‌কা ওষুধ, মলম, কবচ, সাবান, তেল, দাঁতের মাজন, রংবেরঙের বটতলা-মার্কা বইয়ের বাজার—সেটা একেবারে ময়দানেরই ঘটনা; তাছাড়া আছে ভাগ্যগণনার ব্যবস্থা, শক্তিপরীক্ষার ব্যবস্থা, জুয়াখেলার ব্যবস্থা—যেমন থাকত ছেলেবেলার কার্ণিভ্যালে; আর আছে ছেলেমেয়েদের মনটানা এক বিশেষ বিচিত্র জগৎ। ভীড়টা সেখানে স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি, যেখানে খেলা আর খেলোয়াড়ের ছড়াছড়ি। সারা মাঠে বিক্ষিপ্ত ভীড় এক-একটা চক্র সৃষ্টি করে এক-একটা খেলাকে ঘিরে। বাঁদরের খেলা, অজগর সাপের খেলা, কুকুরের খেলা, ভাল্লুকের খেলা, জিমন্যাস্টিক, ম্যাজিক, জাগ্‌লিং—কোনোটাই বাদ নেই। যে কেউ দেখতে পারে সে খেলা। পয়সা দিতে চাইলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় চক্রের মধ্যে, না দিলেও কেউ কিছু বলবে না। তবে তেমন তেমন খেলা দেখলে মন আপনা হতেই চায় ওস্তাদকে ইনাম দিতে।

এই ময়দানেই আমি দেখেছিলাম লক্ষ্মণ কাহারের খেলা। আর সেই খেলা দেখার ফলেই ফটিকচাঁদ গল্প। নক্‌শা করা পিতলের বল আর ধারালো ছুরি নিয়ে এমন জাগ্‌লিং, বোমা লাট্টু নিয়ে এমন ব্যালেন্সিং-এর খেলা, মুখের ভিতর সুতো আর পুঁতি পুরে নিয়ে মুখের ভিতরেই জিভ দিয়ে মালা গেঁথে সেই পুঁতির মালা মুখ থেকে বার করার অবিশ্বাস্য খেলা—এসব জিনিস কোনোদিন কোনো সার্কাসে দেখিনি।

এই আশ্চর্য ক্ষমতার পিছনে যে সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় সেটা সত্যিই শ্রদ্ধা করার জিনিস। বিশেষ করে যখন বুঝতে পারি এদের হয়ে

লাক পেটাবার কোনো লোক নেই, মঞ্চে এদের কোনো স্থান নেই, বা মঞ্চে অবতীর্ণ হবার কোনো স্বপ্নও দেখে না এরা, আর সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার যেটা—এদের যা রোজগার তাতে দুবেলা রুটি জোটে কি না-জোটে তার ঠিক নেই। এমনই গরীব অথচ অতি উঁচুদরের শিল্পী ভারতবর্ষে যে কত আছে তার হিসেব নেই। এক রাজস্থানেই দেখেছি আশ্চর্য সব গাইয়ে-বাজিয়েদের, যাদের নাম কেউ কোনোদিন শোনেনি, আর তারা এত গরীব যে তাদের দিনমজুরী করে খেতে হয়। একবার জয়সলমীরে এক উটের দলের সঙ্গে এলেন এক বংশীবাদক। তিনি মুখে দুটো বাঁশি একসঙ্গে পুরে বাজান—তার একটা ধরে পোঁ, একটায় বাজে সুর। এমন বাঁশি আমি কখনো শুনিনি, অথচ এঁকেও গতর খাটিয়ে খেতে হয়।

লক্ষ্মণ কাহার হায়দরাবাদের লোক সেটা খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম। শীতকালে সে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখানোর জন্য—কোনো বছর দিল্লী, কোনো বছর কলকাতা, কোনো বছর বোম্বাই বা অন্য কোথাও। শহরের কাছেই কোথাও একটা ঝুপড়ি ফেলে তাতে থাকে। রবিবার দিন বিকেলে শহরের মাঠে এসে আসন বিছিয়ে বসে পড়ে খেলা দেখাতে। এই ভাবে শীতটা শেষ করে আবার দেশে ফিরে যায়।

সন্দীপ যখন ফটিকচাঁদ ছবি করা ঠিক করল, তখন লক্ষ্মণ কাহারের খোঁজ করা দরকার হয়ে পড়ল। কলকাতায় খেলা দেখাতে এলে সে থাকে সুভাষগ্রামে সে খবর পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে খোঁজ করে তার পাত্তা মিলল না। সে বছর সে এদিকে আসেনি। হায়দরাবাদে চিঠি লিখে খবর পাওয়া গেল সেখানে একটি গ্রামে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় বাস করে। সন্দীপ গেল হায়দরাবাদে, কিন্তু লক্ষ্মণ কাহার বা তার সমকক্ষ কোনো জাগলারের সন্ধান পেল না। যারা আছে তারা জিমন্যাস্টিক দেখায়; তার ত' কোনো প্রয়োজন নেই ফটিকচাঁদ ছবিতে।

এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ফটিকচাঁদ ছবির শুটিং আরম্ভ করে দেওয়া হল। লক্ষ্মণ কাহারের প্রয়োজন ছিল ছবির জাগলার চরিত্র হারুণের গুরু আসাদুল্লার ভূমিকার জন্য। ইতিমধ্যে হারুণের পার্ট যিনি করবেন তিনি জাগলিং-এর অনেক মারপ্যাঁচ শিখে অভ্যাস করে নিয়েছেন; তাঁকে নিয়েই শুটিং হচ্ছে ময়দানে ভীড়ের মধ্যে। লক্ষ্মণ কাহারকে না পাওয়া গেলে শেষ পর্যন্ত যে কি হবে সে সমস্যা শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে। কানা ছবি বাজারে ছাড়া যাবে না সে কথা সকলেই জানে, কিন্তু এ নিয়ে এখন ভেবে লাভ নেই। একটা কোনো উপায় মিলবে না কি? নিশ্চয়ই মিলবে। আমারও এ অভিজ্ঞতা আছে। পথের পাঁচালির জন্য ইন্দির ঠাকরুন খুঁজে না পেয়ে যা থাকে কপালে করে অপু-দুর্গাকে নিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মনের মতো বুড়ী না পেলে যে কী হত জানি না, কিন্তু পাওয়া ত' গেল চুনিবালা দেবীকে।

ফটিকচাঁদের সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত যে ভাবে হল, তেমন ঘটনা গল্পেই পড়া যায়।

শুটিং চলছে ময়দানে, ভীড়ের মধ্যে কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, তাই সময় লাগছে। ভীড় ত' আর নিজেদের বাছাই করা লোক নয়, যে তারা পরিচালকের কথা শুনবে! এরা সকলেই যে শুধু শুটিং দেখতে চায় তা নয়; সবাই চায় যে ক্যামেরায়

তাদের মুখটা অন্তত একবার দেখা যাক। এই সব লোককে বলে বুঝিয়ে স্বাভাবিক ব্যবহার করানো ভয়ানক কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ ব্যাপার। তার উপরে আছে আলোর সমস্যা। সূর্যদেব মেঘের সুযোগ নিয়ে লুকোচুরি খেলছেন, ফলে দলের লোক সবাই গলদ-ঘর্ম। যে দৃশ্যে সূর্যের আলোর দরকার এবং সূর্যের আলোতেই কাজ শুরু হয়েছে, সেখানে হঠাৎ মেঘ করে বসলে যে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

এমনিই এক কাজের বিরতির মধ্যে হঠাৎ খবর এল এক আশ্চর্য জাগলারের আবির্ভাব হয়েছে মাঠে। সে যে সব খেলা দেখাচ্ছে, ঠিক তেমন খেলারই নাকি বর্ণনা আছে ফটিকচাঁদ গল্পে। তাহলে কি স্বয়ং লক্ষ্মণ কাহারই অকস্মাৎ এসে হাজির হলেন না কি?

সকলে গেলেন সেই খেলা দেখতে। হ্যাঁ, এ একেবারে সেই আসাদুল্লারই খেলা।

রুদ্ধশ্বাসে খেলা দেখার পর খেলোয়াড়কে জিজ্ঞেস করা হল তার পরিচয়। লক্ষ্মণ কাহারের নাম কি সে শুনেছে?

'শুনেছি বৈ কি; তিনি যে আমারই মামা।' বললেন গঙ্গারাও জাগলার।

মামার কাছেই তাঁর তালিম, মায় মামার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তিনি এসেছেন কলকাতার মাঠে খেলা দেখাতে। তাঁর বর্তমান বাসস্থান হল রিষড়ায় এক ঝুপড়িতে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল তিনি একটি ফিল্মের জন্য ক্যামেরার সামনে খেলা দেখাতে রাজি কি না। গঙ্গারাও বললেন, 'কেন দেখাব না, নিশ্চয়ই দেখাব।'

সন্দীপ তৎক্ষণাৎ খেলোয়াড় আর তার সহ-কর্মীকে বাড়িতে নিয়ে এল আমাকে দেখাবার জন্য। সে নিজে লক্ষ্মণের খেলা দেখেনি; আমি দেখলে বুঝব ঠিক এই খেলাই দেখেছিলাম কি না।

দেখলাম তফাৎ শুধু চেহারায়, খেলা হুবহু এক। ইনি যে লক্ষ্মণ কাহারের একই ঘরানার লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যে সমস্যা ফটিকচাঁদের দলের সকলকে ভাবিয়েছিল এক বছর ধরে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেল্‌কির মতো তার সমাধান হয়ে গেল।

★ পাঠভবন আয়োজিত সন্দীপ রায় পরিচালিত ফটিকচাঁদ ছবির প্রিমিয়ার উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকপত্রিকা থেকে পুনঃমুদ্রিত।